মেরী অ্যানিং ও তাঁর জীবাস্মের জগৎ

স্যালি এম ওয়াকার

চিত্রণঃ ফিলিস ভি স্যারফ

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



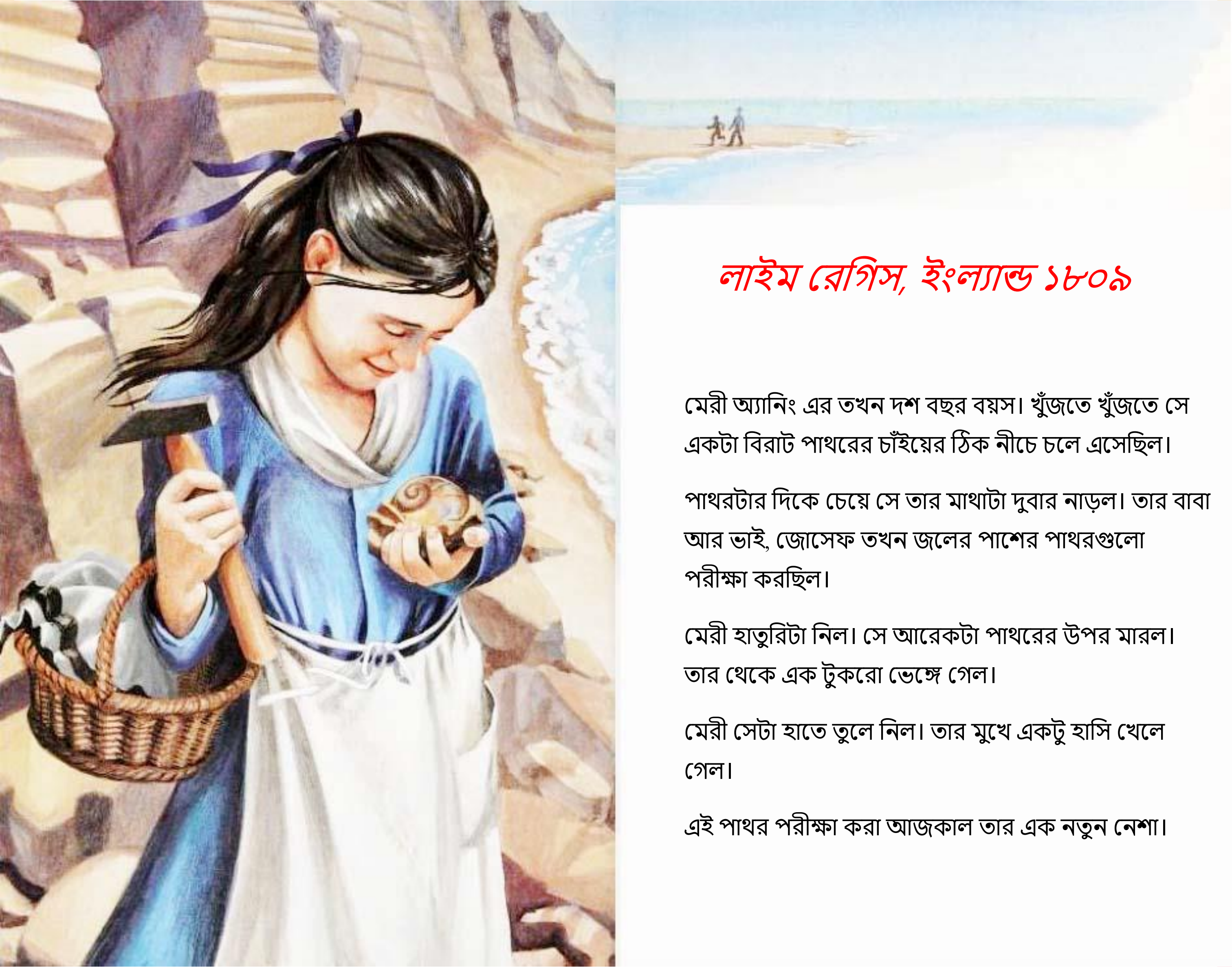


মেরী অ্যানিং ও তাঁর জীবাস্মের জগৎ

স্যালি এম ওয়াকার

চিত্রণঃ ফিলিস ভি স্যারফ

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



লাইম রেগিস, ইংল্যান্ড ১৮০৯

মেরী অ্যানিং এর তখন দশ বছর বয়স। খুঁজতে খুঁজতে সে একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের ঠিক নীচে চলে এসেছিল।

পাথরটার দিকে চেয়ে সে তার মাথাটা দুবার নাড়ল। তার বাবা আর ভাই, জোসেফ তখন জলের পাশের পাথরগুলো পরীক্ষা করছিল।

মেরী হাতুরিটা নিল। সে আরেকটা পাথরের উপর মারল। তার থেকে এক টুকরো ভেঙ্গে গেল।

মেরী সেটা হাতে তুলে নিল। তার মুখে একটু হাসি খেলে গেল।

এই পাথর পরীক্ষা করা আজকাল তার এক নতুন নেশা।

মেরীর আসল কৌতুহলের বিষয় হল জীবাস্ম।

কোনো প্রাণী মারা গেলে। তাদের শরীর আস্তে আস্তে ভাঙতে ভাঙতে প্রাকৃতিক নিয়মেই মাটিতে মিলিয়ে যায়।

হাড় আর খোলাগুলো শুধু পড়ে থাকে।



তার উপর মাটি আর বালির স্তর জমা হয়।

হাজার হাজার বছর ধরে, এইভাবে জমতে জমতে তা পাথরে পরিণত হয়।

তখন তাদের ফসিল বা জীবাস্ম বলে।

উদ্ভিদ থেকেও জীবাস্ম তৈরী হয়।

এমনকি প্রাণীদের পায়ের ছাপও পাথরের উপর জমে গিয়ে অনন্তকাল থেকে যেতে পারে।



মেরী, জোসেফ, আর তাদের বাবা তিনজন মিলে জীবাশ্মের খোঁজ করত।

তারা যত জীবাস্ম সংগ্রহ করেছিল তা বেশীরভাগই প্রাণীর জীবাস্ম ছিল। সেসব প্রাণী লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত।

এদের মধ্যে অনেকেই অ্যামোনাইট প্রজাতির ছিল।

অ্যামোনাইট আসলে একধরণের খোলাওয়ালা প্রাণী।

অ্যামোনাইটদের সমুদ্রে পাওয়া যেত।

তাদের শরীরটা চ্যাপ্টা হত, আর খোলাটা ছিল কুন্ডলীর মত।





সেসময়টা ছিল সতেরশ শতাব্দী।

তখন মেয়েদের পড়ারই চল ছিল না, আর জীবাস্ম নিয়ে পড়া? সে ভাবাই যেত না।

মেরীর জীবনটা সেসময়কার অন্য মেয়েদের জীবনের থেকে আলাদা ছিল।

মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে? সাধারণ ঘরে কেউ ভাবতে পারত না। তবে মেরীর বাবা রিচার্ড এরকম ভাবতেন না।

তিনি তার ছেলে জোসেফ আর মেয়ে মেরী দুজনকেই জীবাস্ম সংগ্রহের জন্য নিয়ে যেতেন।



অ্যানিং পরিবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ে হেঁটে বেড়াতেন।

সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে থাকতেন তাঁরা -কখনো জল ঠেলে, কখনো পাহাড় ঠেঙিয়ে, কখনো পাথরের উপর দিয়ে, কখনো বা পাথরের ধার ঘেঁসে তাঁরা হেঁটে চলতেন।

ঝড়, জল, বৃষ্টি, তুফান, বরফ সব তুচ্ছ করে তারা চলতেন।

তাঁদের চলার পথে এদিক ওদিক যেসব পাথর থাকত বা খসে পড়ত, কখনো কখনো সেসব পাথরে জীবাস্মও থাকত।

রিচার্ড মেরী আর জোসেফকে জীবাস্ম চিনিয়েছিলেন। আর এও শিখিয়েছিলেন কিভাবে পাথর চিনে জীবাস্ম বের করতে হয়, আর কিভাবে তা সংগ্রহ করতে হয়।



তখন মেরীর ১১ বছর বয়স।

মেরীর বাবা একদিন এক পাথরের উপর থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন।

রিচার্ড তখন এমনিতেই অসুস্থ ছিলেন।

এই পড়ে যাবার পরে তিনি আরো দুর্বল হয়ে পড়েন।

সেই বছরই অক্টোবর মাসে, তিনি মারা যান।

অ্যানিং পরিবার যে শুধু মজা করার জন্যই জীবাশ্মের খোঁজ করত তা নয়।

রিচার্ড অ্যানিং জীবাশ্মগুলোকে তাঁর আসবাবপত্রের দোকানে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখতেন।

যাঁরা লাইম রেগিস বেড়াতে আসতেন তাঁরা এগুলি কিনেও নিতেন।

এই পয়সায় অ্যানিংদের সংসার চলত।



রিচার্ডের আসবাবপত্রের দোকানও উঠে যায়।

এই দোকান না চলায় অ্যানিংদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে।

এর উপরে তাদের অনেক ধারদেনাও হয়ে যায়।

জীবাস্ম বেচা ছাড়া তাদের আর কোনো গতি থাকে না।

মেরীর মা-ই এই জীবাস্ম বেচার ব্যবসার হাল ধরেন।

মেরী আর জোসেফ তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতে থাকে।

মেরী আর জোসেফ সমুদ্রের ধারে ঘুরে ঘুরে, ঠান্ডা, ঝড়, জল বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে জীবাস্ম খোঁজায় মন দেয়।

শীতের সময় ঝড় হলে সমুদ্রের পাড়ে উঁচু পাহাড়ের ধার থেকে পাথর খসে খসে পড়ে। ঐ পাথরের মধ্যে জীবাস্ম পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

মেরী আর জোসেফ খুব সতর্ক হয়ে জীবাস্ম খোঁজার কাজ করতে থাকে।

কারণ যদি ঐ পাথর খসে তাদের উপর পড়ে, তাহলে তাদের জীবন সংশয়ও হতে পারে।





সেটা ছিল ১৮১১ সাল। জোসেফ একটা মাথার খুলি খুঁজে পায়।

সেই খুলিটায় একটা সরু মুখ আর অনেক দাঁত ছিল।

ওটা অনেকটা একটা কুমিরের মত লাগছিল।

জোসেফ মেরীকে দেখায় আর বলে ঠিক কোথায় সেটা পেয়েছিল।

প্রায় এক বছর ধরে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে মেরী সেই জীবাস্মর বাকী অংশ পায়।

কি বিশাল সেই জীবাস্ম!

মেরী সেটাকে একা পাথরের থেকে খুঁচিয়ে বের করতে পারছিল না বলে তার মা কে ডেকে দেখান।

অবশেষে মেরী আর তার মা শহর থেকে লোক ভাড়া করে আনেন।

তারা মেরীকে সাহায্য করে সেই জীবাস্ম উদ্ধার করতে।

তারা সবাই মিলে সেই জীবাস্ম বয়ে নিয়ে আসে তাদের বাড়ী।

অ্যানিং রা সেই জীবাস্ম বেচে দেয়।

যিনি সেটা কেনেন তিনি জীবাস্মটাকে লন্ডনের মিউজিয়ামে দিয়ে দেন।

সেখানের বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পরে যায়।

তাঁরা সামনে একটা সরীসৃপের জীবাস্ম দেখতে পান যা কিনা সমুদ্রে পাওয়া যেত!

এ এক অবাক করা সরীসৃপ!

১৮১৭ সালে, তাঁরা এই সরীসৃপের নাম দেন ইথিয়োসর।





এই ইথিয়োসর বেচে অ্যানিংদের যা লাভ হয় তাদিয়ে বেশকিছুদিন কেটে যায়।

কিন্তু তাদের অবস্থার উন্নতি হয় না।

জোসেফ আরও আয় বাড়ানোর জন্য একটা কাজ নেন।

তাঁর কাজ ছিল প্রতিটা আসবাব ঢেকেঢুকে পরিষ্কার করে রাখা।

অন্যদিকে মেরী জীবাস্ম খোঁজার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।



কর্নেল থমাস বার্চ অ্যানিং দের কাছ থেকে অনেক জীবাস্ম কিনতেন।

তিনি জানতেন ইংল্যান্ডে সংগৃহীত সব জীবাস্মর মধ্যে অ্যানিং দের অবদান কত উল্লেখযোগ্য।

তিনি অ্যানিং দের আর্থিক অবস্থা নিয়েও খুব চিন্তিত ছিলেন।

১৮২০ সালে, তিনি তাঁর সব সংগৃহীত জিনিস বেচে সব টাকা মেরীর মাকে দিয়ে দিলেন।

১৮১৯ সালটা অ্যানিং দের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য।

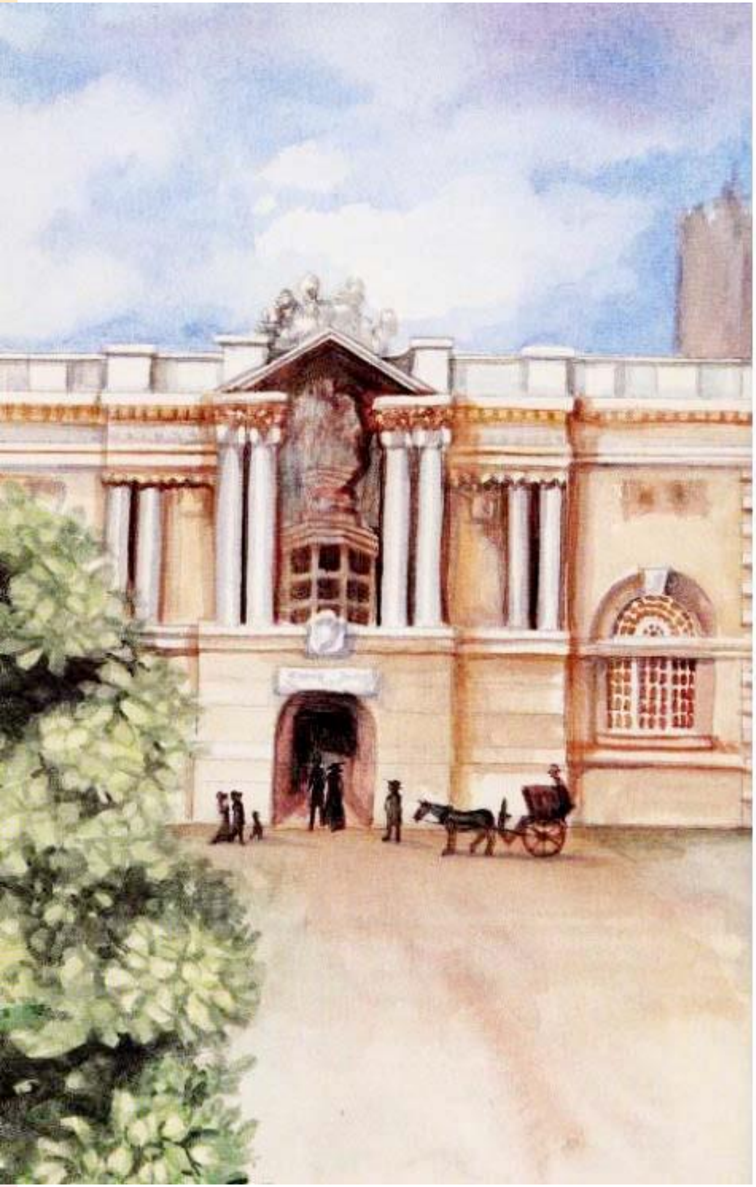
প্রায় বছর খানেক ধরে কোনো জীবাস্ম তাদের হাতে না আসায় অ্যানিং দের অবস্থা আর্থিক ভাবে খুব খারাপ হতে থাকে।

কিন্তু মেরীর মাকে তো সব ধারের টাকা মেটাতে হবে!

তিনি তাদের সব আসবাব বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

এমনই সময় যিনি অ্যানিং দের কাছ থেকে জীবাস্ম কিনেছিলেন তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।





ঠিক তার পরের বছরই অ্যানিং রা আরেকটি ইথিয়োসরের জীবাস্ম খুঁজে পেলেন।

এক দল মানুষ সেই জীবাস্ম কিনে নিলেন।

তাঁরাই সেটা মিউজিয়ামকে দিলেন। তখনকার দিনে, যাঁরা জীবাস্ম খুঁজে পেতেন তাঁদের মিউজিয়াম থেকে কোনোরকম কৃতিত্ব দিত না।

সব কৃতিত্ব শুধু যাঁরা জীবাস্ম তাদের কাছে নিয়ে আসতেন তাঁদের হত।

তাই এবারও যাঁরা ইথিয়োসরের জীবাস্ম নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নামই রেকর্ডে তুলে রাখলেন।

অ্যানিং দের কথা কোথাও লেখা হল না।

মেরীর বয়স যখন ২৪ বছর হল, তিনি তখন আরেকটি জিনিস খুঁজে পেলেন।

তিনি প্লেসিওসরের জীবাস্ম আবিষ্কার করলেন।

ইথিয়োসরের মত প্লেসিওসর ও সামুদ্রিক প্রাণী ছিল।

মেরী যে প্লেসিওসর আবিষ্কার করেছিলেন সেটা ৯ ফুট লম্বা আর ৬ ফুট চওড়া ছিল।

সাপেদের মত তার মুখেও অনেক দাঁত ছিল। তার দেহটা অনেক লম্বা ছিল। পায়ের বদলে তার চারটে চ্যাপ্টা প্যাডেল ছিল।





মেরীর আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত প্লেসিওসরের আংশিক জীবাস্মই পাওয়া গেছিল।

বিজ্ঞানীরা বুঝতেই পারছিলেন না আসলে ওটা ঠিক কি জীব।

মেরীর পাওয়া জীবাস্মটি প্রায় সম্পুর্ণ প্রাণীটার ই ছিল।

বিজ্ঞানীরা এর মাধ্যমে অনেক কিছু নতুন জানতে পারলেন।

প্লেসিওসর এক সম্পুর্ণ নতুন প্রজাতির সরীসৃপ বলে চিহ্নিত হল।

এর কথা এর আগে পৃথিবীতে কারোর জানা ছিল না।

একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেরীর জীবাস্ম সম্বন্ধে এক খবর ও প্রকাশ করলেন। তিনি যদিও মেরীর নাম তাতে প্রকাশ করলেন না, তবুও অনেক মানুষই জানতে পারল যে এটা মেরীরই আবিষ্কার।

আর এর পরই মানুষেরা মেরী অ্যানিং এর সাথে দেখা করবেন বলে ভীড় জমালেন।

মেরী এবার তাঁর প্রিয় জীবাস্মগুলো সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে লাগলেন

অন্যলোকেদের পাওয়া জীবাস্ম নিয়েও তিনি পড়তে লাগলেন।

লাইম রেগিসেই ফিলফটদের বিরাট সংগ্রহ ছিল জীবাস্মের।

তারা মেরীকে দেখালেন।





মেরী বিজ্ঞানীদের চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

মেরী যা পড়াশোনা করেছিলেন তার সাথে তিনি যে জীবাস্মগুলো পেয়েছিলেন তাদের মিল খুঁজতে লাগলেন। তিনি তাঁর পাওয়া জীবাস্মগুলির সাথে জীবন্ত সামুদ্রিক প্রাণীদের ও মিল ও অমিল খুঁজতে লাগলেন। সেসব তিনি বিজ্ঞানীদের জানাতে শুরু করলেন।

বিজ্ঞানীরা তাঁকে আরও বই আর পেপার পাঠাতে লাগলেন।

বিজ্ঞানীরাও মেরীর উৎসাহ ও জ্ঞান দেখে ধীরে ধীরে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন।

১৮২৫ সাল যেতে না যেতে মেরীর ভাই জোসেফ জীবাস্মের ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়ালেন।

মেরীর কাঁধেই সব দায়ীত্ব এসে পড়ল।

তখনকার দিনে মহিলাদের ব্যবসা করার চল ছিল না। আর জীবাস্মের খোঁজ করা? ভাবাই যেত না।

সবাই মেরীকে যেন অন্য জগতের মনে করত। বয়স আন্দাজে তাঁকে সবাই অনেক বড়ও ভাবত।

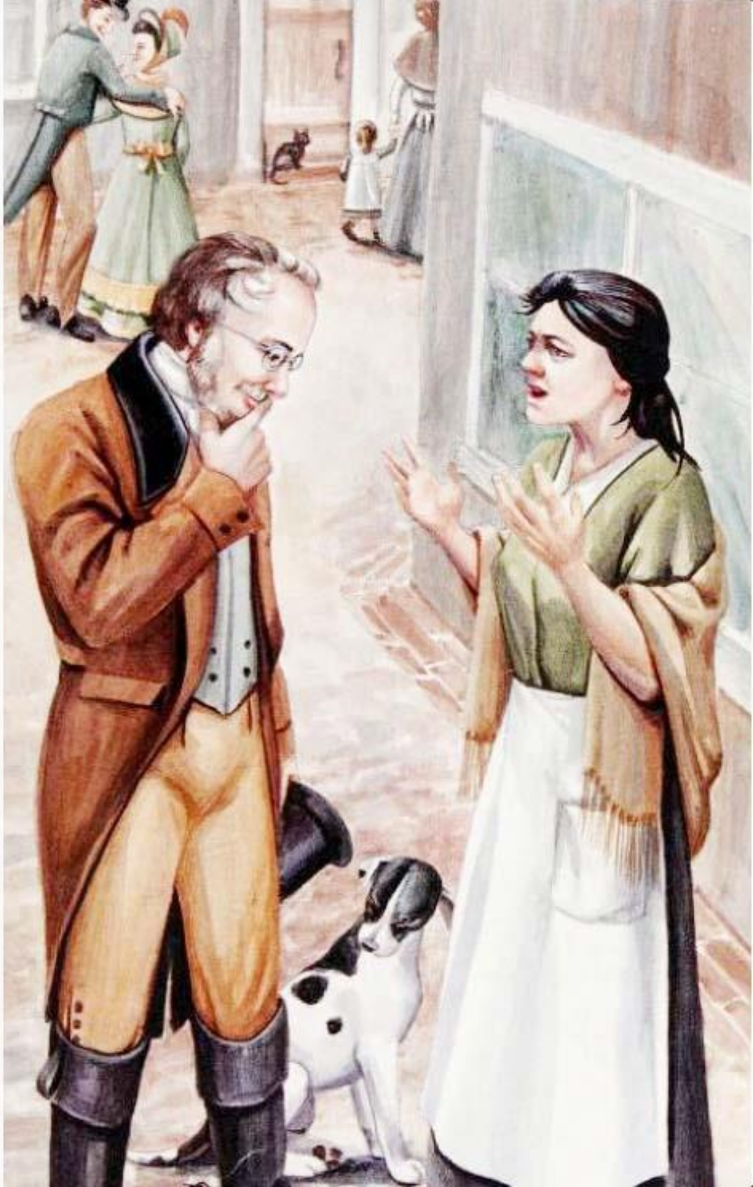
মেরী আরও অন্যভাবেও সবার থেকে আলাদা ছিল।

তিনি তাঁর মনে যা আসত তাই বলতেন। জীবাস্মগুলোই তাঁর জগত ছিল; তাদের নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন ও পড়তেন।

তিনি হাড়গুলো কিভাবে একটা সাথে একটা জোড়ে ভালভাবে জানতেন।

যদি কোন বিজ্ঞানী দুটো হাড় ভুল্‌ভাবে জুড়তেন, তাঁদের তিনি সাথে সাথে বলে দিতেন।

ভুল দেখলে তিনি তা বলতে কখনো পিছপা হতেন না।



প্রতিদিন মেরী জীবাস্মের খোঁজে যেতেন।

কখনও তিনি তার জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটতেন।

এই হাঁটায় তাঁর সঙ্গী হত তাঁর একমাত্র কুকুর, ট্রে।

মেরীর এত পরিশ্রম সফল হল যখন তিনি ১৮২৮ সালের মাঝামাঝি বেলেমনাইট খুঁজে পেলেন।

বেলেমনাইট নামের প্রাণীটি বহু বহু বছর আগে সমুদ্রে বাস করত।

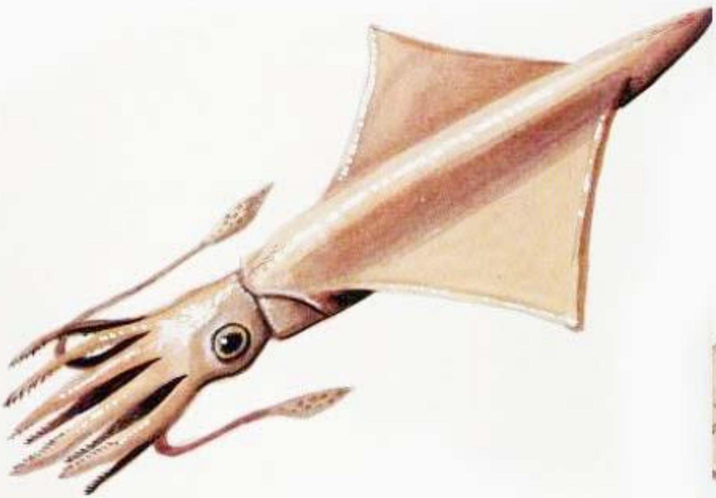
অনেকটা স্কুইডের মত দেখতে এই প্রাণীটি কালির মত একটা তরল ছেটাত।

মেরী আগেও বেলেমনাইট পেয়েছিলেন।

কিন্তু এইবারেরটা অনেক অদ্‌ভুত ছিল।

বেশীরভাগ জীবাস্মগুলোই হাড় বা খোলা দিয়ে তৈরী ছিল, নরম দেহাংশ এর আগে কোনোটাতেই ছিল না।

মেরীর এই নতুন জীবাস্মটিতে বেলেমনাইটের শরীরে তরল কালি জমানোর যে থলিটি ছিল সেটার বাইরের দিকের আবরণটা লাগা ছিল। শুধু তাই নয়, তাতে খানিকটা তরল কালিও ছিল।





ঐ বছরের শেষদিকে, মেরী টেরোসরের জীবাশ্ম আবিষ্কার করলেন।

টেরোসর ছিল একধরনের সরীসৃপ, যাদের পাখনা ছিল।

মেরীই প্রথম তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পান।

সেই জীবাশ্ম দেখে সারা বিশ্ব অবাক হয়ে গেল।

এটাতো অনেকটা উড়ন্ত ড্রাগনের মত।

দাঁত আছে, বাঁকানো নখ আর পাখনাও আছে।

এটা কি সত্যি কোনোদিন জীবিত ছিল?

একজন বিজ্ঞানী উইলিয়াম বাকল্যান্ড মেরীর এই জীবাশ্ম নিয়ে একটা রিপোর্ট লিখেছিলেন।

তিনি মেরীর কথাও তাতে উল্লেখ করেছিলেন।

তা পড়ে সবাই মেরীর কথা জানতে পারল।



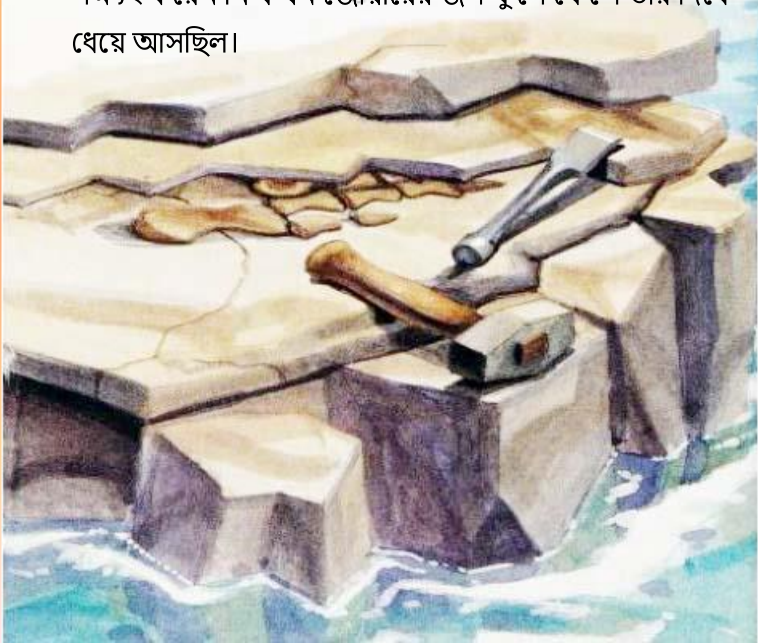
মেরী যখন জীবাস্ম সংগ্রহ করতেন, তাঁর সময়ের কোনো হুঁশ থাকত না।

তাঁর আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তিনি কোনো দিকেই তাকাতেন না।

১৮২৯ সালে একদিন যখন মেরী একটা পাথরের চাঁইএর থেকে একটা জীবাস্মকে আলাদা করছিলেন, তখন ঠিক একই ভাবে তাঁর কোনো দিকে হুঁশ ছিল না।

তিনি পাশেই সমুদ্রের জলের দিকে কোনো নজরই দেন নি।

লক্ষ্যই করেন নি কখন জোয়ারের জল ফুলে ফেঁপে তাঁর দিকে ধেয়ে আসছিল।





তাঁর কিছু বোঝার আগেই কয়েকটা পাথরের চাঁই খসে পড়ল।

মেরী আর তার সাথী জলের মধ্যে দিয়ে কোনোক্রমে বিপদমুক্ত জায়গায় পৌঁছাতে পারলেন।

ঠিক সময়মত তারা বেড়িয়ে আসতে পেরেছিলেন।

মেরীর কথামত এই জীবনের ঝুঁকি নেওয়া তাঁর সার্থক হয়েছিল।

তিনি একটা প্লেসিওসরের জীবাস্ম খুঁজে পেয়েছিলেন।

আর এটা আগেরটার চেয়েও অনেক ভাল ছিল।



১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, মেরী একটা আশ্চর্য ধরনের জীবাশ্ম খুঁজে পেলেন।

তার দাঁতগুলো অনেকটা আঁকশির মত ছিল।

তার শরীরে বড় ডানার মত ছিল। অনেকটা স্ট্রিং রের মত দেখতে ছিল।

এর জন্য মেরী একটা স্ট্রিং রে কে কেটে দেখেছিলেন এই জীবাস্মের সাথে এই প্রাণীর হাড়ের বিন্যাসের কোনো মিল আছে নাকি।

তিনি দেখলেন তাদের হাড়ের কোনো মিল নেই।

তবুও মেরীর মনে হল ওটা এক প্রকারের মাছের।

কিছু বিজ্ঞানী তাঁর সাথে একমত হলেন।

অন্যরা বললেন, এটা তো সরীসৃপের! কিম্বা হয়ত বা একধরনের পাখীর।

বহু বছর পরে, বিজ্ঞানীরা নানান পরীক্ষা করে বললেন এটা হল একধরনের মাছের।

এটা হল চিমেরার।

চিমেরার ছুঁচালো মুখ ছিল। আর লেজটা ছিল লম্বা চাবুকের মত।

ঠিক যেমন মেরী ভেবেছিলেন, এরা স্ট্রিং রের-ই প্রজাতি।



১৮৩০ সালে, মেরী তৃতীয় প্লেসিওসর খুঁজে পেলেন।

তারপর আরও অনেক ছোট ছোট প্রাণীর জীবাস্ম খুঁজে পেলেন।

১৮৩৩ এ তিনি আবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন।

তিনি আবার এক বিরাট পাথরের চাঁইয়ের নীচ দিয়ে জীবাস্ম খুঁজছিলেন।

ট্রে তাঁর আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছিল।

হঠাত একটা ঘড়ঘড় গর্জন মেরীর কানে গেল।

পাথরের আঘাতে ট্রে আহত হল। আর তার সাথে সাথেই ট্রে মারা গেল।

মেরী খুবই ভেঙে পড়লেন।

কিন্তু জীবাস্মের খোঁজ থেকে তিনি বিরত হলেন না।





তাঁর জীবাশ্মের পসার ও ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। তিনি একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিলেন, বড় দোকানও দিলেন।

তিনি লাইম রেগিসের অনেক গরীবের প্রয়োজনে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

লোকসমাজে ধীরে ধীরে তাঁর পরিচিতি বাড়তে লাগল।

মেরী ছোট ছেলেমেয়েদের জীবাশ্ম নিয়ে পড়াতেও শুরু করলেন।

যারা জীবাশ্ম নিয়ে উৎসুক ছিল তাদের পড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

১৮৪৭ সালে তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরেও তাঁর জীবাশ্ম নিয়ে আজও লোকে পড়াশোনা করে।

ঐ অদ্‌ভুত প্রাণীদের নিয়ে আজও মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই।

জীবিত অবস্থায় নিজের কাজের জন্য মেরী বিশেষ কৃতিত্ব না পেলেও জীবাশ্মের খোঁজ করা থেকে মেরী অ্যানিং কখনো থেমে থাকেন নি।



তাঁর জীবাশ্মগুলো মানুষের সামনে লক্ষ লক্ষ বছর আগের সমুদ্রের তলার এক অন্য জগত খুলে দিয়েছিল।



মেরী অ্যানিং

মেরী অ্যানিং এর সময়, মহিলাদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার কথাই কেউ ভাবতে পারত না, তার আবার বিজ্ঞানী হওয়া। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা মেয়েদের জন্য বন্ধ ছিল। মেরীর পক্ষে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি নিজের থেকেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় জীবাস্ম নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন। মেরীর কাছ থেকে যাঁরা জীবাস্ম কিনেছিলেন তাঁরা মনে করতেন জীবাস্ম সম্বন্ধে মেরীর থেকে বেশী জ্ঞান পুরো ইংল্যান্ডে কারোর ছিল না।

মেরী তার অবদানের জন্য খুব ই কম স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ঐসময়, বিজ্ঞানীদের পক্ষেও তাঁর মত একজন যিনি সামান্য আয়ের জন্য জীবাস্ম বিক্রি করতেন, তাঁকে ভুলে যাওয়া খুব সহজ ছিল। ইথিয়োসর বিষয় পড়তে গেলে মেরীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু খুবই নামমাত্র।

ঐ সময়কার চিঠিপত্র, জার্নাল, আর বৈজ্ঞানিক লেখা থেকে আজ আমরা মেরীর অবদান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। মেরী যে জীবাস্মগুলো আবিষ্কার করেন, তা আমাদের পৃথিবী, তার ইতিহাস আর প্রাণীদের বিবর্তন সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে মানুষ আজ মেরী অ্যানিং কে চিনেছে, জীবাস্ম সংগ্রহকারীদের মধ্যে যাঁর নাম স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে।